আদর্শ জাতি গঠনে
কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাব্যবস্থা

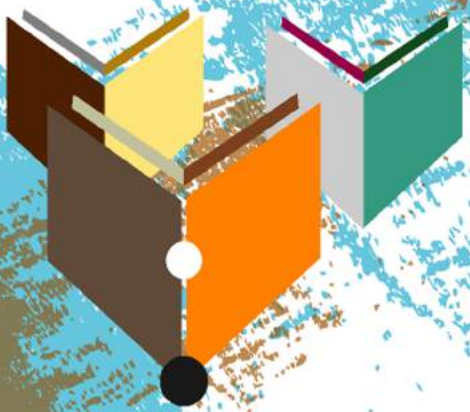

বাংলাদেশ
ইসলামী ছাত্রীসংস্থা

Bangladesh Islami Chhatrisangstha
http://www.islamichhatrisangstha.org

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
টুডে এড

প্রকাশকাল
আগষ্ট ২০১৫
শ্রাবণ ১৪২২
শাওয়াল ১৪৩৬

মুদ্রন
টুডে এড

মূল্য
১২ টাকা

“

পড় তোমার রবের নামে। যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত পিন্ড থেকে। পড় এবং তোমার রব বড়ই মেহেরবান, যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান দিয়েছেন । মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানতো না।

(সূরা আলাক্ব: ১ - ৫)

”

সৃষ্টির সেরা

২ শ্রেষ্ঠত্বের নেপথ্যে

সুনীল আকাশ!
দিনে তার বুকে প্রদীপ্ত সূর্য আর রাতে হাজারো তারার মেলা। মাটির বুকে সবুজ ঘাসের চাদর, আর তার মাঝে ছায়াদানকারী সুউন্নত বৃক্ষ। প্রতিটি জিনিসের দিকে তাকালেই মুগ্ধ হতে হয়। আর সব কিছু থেকে চোখ ফিরিয়ে যদি নিজের দিকে তাকাই, তাহলে আরো বেশি অবাক হতে হয়। সত্যিই এক অসাধারণ সৃষ্টি এই মানুষ। নিখুঁত তার দৈহিক কাঠামো, অপূর্ব তার গঠনশৈলী। সুবহানআল্লাহ!
তবে সবচেয়ে অভিনব যে বৈশিষ্ট্য মানুষকে সৃষ্টি জগতে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় আসীন করেছে, তা নিঃসন্দেহে তার বুদ্ধি-বিবেক, চিন্তা করার শক্তি, তথা জ্ঞান।
আর এ জ্ঞানের উৎকর্ষতাই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের হাতিয়ার।

চাই আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা

৩

পবিত্র কুরআনের প্রথম নির্দেশ "পড়!"
একটি জাতির বিকাশ ও টিকে থাকা নির্ভর করে তাদের জ্ঞানগত উৎকর্ষতার উপর। আর একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থাই তার উপযুক্ত মাধ্যম।

একটি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা তার জাতির মেধাগুলোকে সঠিক পরিচর্যা করে, প্রতিটি সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করে এবং সামগ্রিকভাবে জাতিকে সমস্ত পঙ্কিলতা, সকল আবিলতা মুক্ত রাখে। সেই সাথে মেধাগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে সমগ্র জাতি উন্নত থেকে উন্নততর অবস্থার দিকে এগিয়ে যায়।

একটি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের বিশ্বাসকে জ্ঞান ও কর্মের সাথে জুড়ে দেয়।

সমাজের সচেতন সদস্য হিসেবে আজ সময় হয়েছে একটু ভেবে দেখার, একটি পর্যালোচনার।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কি কাঙ্ক্ষিত জাতি গঠনে সহায়ক হচ্ছে?
আমরা কি পারছি নৈতিকতা বোধ সম্পন্ন একটি প্রজন্ম গড়ে তুলতে?
বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার আজন্ম লালিত স্বপ্ন কতটুকু পূরণ করছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা?
একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদের স্বপ্নগুলো মোটেই উচ্চাভিলাষী নয়।
তাহলে কোন সেই শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের স্বপ্ন পূরণে সহায়ক হবে?
আজ সময় হয়েছে তাও খুঁজে বের করার।

শিক্ষা কি?

৪ শিক্ষা হলো একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া যার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন মানুষ তৈরী করা যারা নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা এবং আদর্শ অনুযায়ী সংস্কৃতি তৈরী করবে। যার মাধ্যমে একটি জাতি গঠিত থাকবে হাজার হাজার বছর ধরে। দার্শনিক Herman H.Horne -বলেন, *"শিক্ষা হচ্ছে শারীরিক, মানসিক দিক দিয়ে বিকশিত, মুক্ত সচেতন মানব সত্ত্বাকে খোদার সংগে উন্নত ভাবে সমন্বিত করার একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া, যেমনটি সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত রয়েছে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগগত এবং ইচ্ছাশক্তি সমন্বিত পরিবেশে।"* শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ***বাশার*** বলেছেন, *"পূর্ণাঙ্গ মানুষের আত্মপ্রকাশের জন্য যেসব গুণাবলি নিয়ে শিক্ষার্থীরা এ পৃথিবীতে আগমন করেছে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সেসব গুণাবলীর যথাযথ বিকাশ সাধন।"*

কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ:

সুনির্দিষ্ট আদর্শকে সামনে রেখেই একটি জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে। আর তাই শুরুতেই সেই জাতীয় আদর্শ নির্ধারণ করা জরুরী যেখানে জাতীয় সংস্কৃতি প্রতিফলিত হবে। তা না হলে সেই ব্যবস্থা কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বয়ে আনবে। একজন মানুষ যদি তার সমগ্র জীবন নিয়ে চিন্তা করে তাহলে তার মনে কিছু প্রশ্ন জেগে ওঠাই স্বাভাবিক। যেমন-

- কি তার পরিচয়?
- কি তার দায়িত্ব?
- দায়িত্ব পালনের পন্থাই বা কি?
- আর তার জীবনের চূড়ান্ত মনযিলই বা কি হবে?

এই প্রশ্ন গুলো ঘিরেই সমাজে বিভিন্ন দল তৈরী হলেও মূলত ২ টি প্রধান আদর্শ দেখা যায়:

প্রথমত: প্রাকৃতিকভাবে বিবর্তনের মাধ্যমেই মানুষের সৃষ্টি। দুনিয়ার জীবনই তার একমাত্র জীবন। মৃত্যুর পর জীবনের কোন অস্তিত্ব নেই। তাই দুনিয়ার জীবনকে ঘিরেই মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা, আকাঙ্ক্ষা কেন্দ্রীভূত হবে।

দ্বিতীয়ত: সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানুষই একমাত্র আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা পেয়েছে। প্রতিনিধির কাজই হচ্ছে যার কাছ থেকে সে এসেছে তার ইচ্ছা বাস্তবায়ন করা। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ছিল মহান রাব্বুল আলামীনের মর্জি অনুযায়ী পৃথিবীতে ন্যায়, ইনসাফ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

আদর্শের এই ভিন্নতার কারণেই শিক্ষা ব্যবস্থার ধরণও ভিন্ন হয়ে যায়। একদিকে দুনিয়ামুখী, বস্তুবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা; অপর দিকে আখিরাতমুখী, আল্লাহমুখী ধর্মীয় আদর্শ সম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা

উৎস কথা ও ভিত্তিঃ

পৃথিবীর আকাশ থেকে ইসলাম নামক সৌভাগ্য সূর্য্য যখন অস্তমিত হলো তখন এমন একটি শাসকগোষ্ঠী বিজয়ী শক্তির আসনে অধিষ্ঠিত হলো দুনিয়ার জীবনই যাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। ভোগ বিলাসিতাই যাদের উন্নতির মূলকথা। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত বিজয়ী শক্তির আদর্শ, ভাব, ভাষা, কৃষ্টি, সভ্যতা ও ঐতিহ্য পরাজিত শক্তির উপর যুগে যুগে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় পলাশী ট্রাজেডির মাধ্যমে মুসলিম শাসনের শোচনীয় পরাজয় হয়। ক্ষমতায় আসে বৃটিশরা। এর সাথেই সেদিন এ উপমহাদেশের সভ্যতা, ভাষা, সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যায় । উর্দু ও ফারসী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজীকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত করা হয়। শিক্ষার বিষয়বস্তুকেও ইংরেজরা তাদের সভ্যতা ও আদর্শের ছাঁচে ঢালাই করে নেয়। এর প্রবর্তক লর্ড মেকলে ১৮৩৫ সালে এ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশমালার ভূমিকায় বলেন,

"আমরা অবশ্যই এমন একটি জাতি গঠন করব যারা রক্ত ও বর্ণে হবে ভারতীয় কিন্তু চিন্তা, নীতি ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ"। এই মূলনীতির আলোকে রচিত শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই ছিলো রাজ্য শাসন বিস্তার ও নিজেদের চিন্তা চেতনার উপযোগী লোক তৈরী। ফলে আমাদের দেশ থেকেই তৈরী হচ্ছিলো ব্রিটিশ শাসন, সভ্যতা, ও সংস্কৃতির প্রতি অনুগত মানুষ। সেদিন বাংলাদেশ ছিল উপমহাদেশের ক্ষুদ্র একটি অংশ। কিন্তু আজ স্বাধীন সার্বভৌম, স্বতন্ত্র একটি দেশ। অথচ আমরা সেই বিদেশী শক্তির দাসত্বের মন-মানসিকতা ও গোলামী চেতনা থেকে বের হয়ে আসতে পারিনি আজও।

গৃহীত পদক্ষেপ সমূহঃ

ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত শিক্ষানীতি সংস্কারের জন্য বহু কমিশন গঠিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৯টি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে যার ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ আমরা পাই জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০। বিগত শিক্ষানীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল স্বাধীনতার পর পরই কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন(১৯৭২), বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৮৭), শামসুল হক শিক্ষা কমিশন (১৯৯৭), বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (২০০৩) ইত্যাদি। যদিও এ নীতিমালার খুব কমই জাতীয় প্রয়োজনে পরিবর্তিত হয়েছে বরং বেশীর ভাগই পদ্ধতিগত পরিবর্তন হয়েছে।

বর্তমান শিক্ষা কাঠামোঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার যে ধারাগুলো বিদ্যমানঃ

১) সাধারণ শিক্ষা
২) মাদ্রাসা শিক্ষা
৩) ইংলিশ মিডিয়াম
৪) কারিগরি শিক্ষা

বিভিন্ন ধারায়

শিক্ষাব্যবস্থা

৬ সাধারণ শিক্ষা

এ দেশের জনগণের সবচেয়ে বড় অংশের শিক্ষার চাহিদাই পূরণ করে সাধারণ শিক্ষা। এ শিক্ষাব্যবস্থা থেকেই অনেক মেধাবীরা বের হয়ে দেশ-বিদেশ সুনাম কুড়িয়েছে সত্য। কিন্তু বেশ কিছু ত্রুটির কারণে জাতি সামগ্রিক ভাবে শিক্ষার সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ত্রুটিগুলোই আমাদের মেধাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ দিচ্ছেনা। আর তাই আমাদের অগ্রযাত্রার গতি এখনো খুব ধীর। মৌলিক যে ত্রুটিগুলো প্রতীয়মান হয়ঃ

শিক্ষা কাঠামোর পরিবর্তন

বারবার শিক্ষা কাঠামোর পরিবর্তন এ শিক্ষাব্যবস্থার একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।একটা শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগের পর তার সুফল পাওয়ার আগেই পরীক্ষামূলকভাবে নতুন আরেকটা পদ্ধতি চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে।

শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন কি শুধুই পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তনঃ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন বলতে শুধু পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তনই দৃশ্যমান হয়। অথচ নতুন একটা শিক্ষাব্যবস্থার সাথে শুধু পাঠ্যপুস্তক নয়, আনুষঙ্গিক সবকিছুই নিশ্চিত করা জরুরী। অপরিকল্পিত পরিবর্তনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ সৃজনশীল পদ্ধতি। এ পদ্ধতির চিন্তাটা সুন্দর কিন্তু তার সঠিক প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত না করায় শিক্ষার্থীরা আরো বেশি গাইড নির্ভর, কোচিং নির্ভর হয়ে পড়ছে।

পরীক্ষা নির্ভর মেধার মূল্যায়নঃ

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় মেধার মূল্যায়ন শুধুমাত্র পরীক্ষা ও রেজাল্টের উপর নির্ভরশীল। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তির সৃজনশীলতা বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। যে কোন উপায়ে ভালো রেজাল্টই তাই এখানে মূখ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেজন্য যে পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে তা নৈতিক হোক বা অনৈতিক। আর এজন্যই পরীক্ষায় নকল বা দেখে লেখা এতটা সহজ স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্নফাঁসের মহোৎসবে শিক্ষার্থীদের সাথে অভিভাবক এমনকি শিক্ষকরাও যুক্ত হচ্ছেন। জাতি হিসেবে আমরা ঠিক কোন দিকে এগিয়ে চলেছি চিন্তা করেছি কি?

নৈতিক শিক্ষা বিবর্জিত শিক্ষাব্যবস্থাঃ

নীতি-নৈতিকতা শেখা ও প্রয়োগের জায়গাটা এ শিক্ষাব্যবস্থায় খুবই সীমিত। আর এটাই সবচেয়ে বড় ত্রুটি। আমরা যতই উচ্চ শিক্ষিত জাতি তৈরী করি না কেন নৈতিকতা হারিয়ে কোন দিনই মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার স্বপ্ন দেখতে পারি না।

আদর্শিক শিক্ষার দৈন্যতাঃ

শিক্ষার্থীদের তাদের আদর্শের সাথে পরিচিত করানো ও সে অনুযায়ী আত্মগঠনের দিক নির্দেশনা ও পরিবেশ সবটুকুর অভাব এখানে খুবই প্রকট। আমরা মুসলিম জাতি হয়েও আমাদের শিক্ষার্থীরা ইসলামী আদর্শ চেনা ও তা প্র্যাকটিসের উৎসাহ পাচ্ছে না। ইসলামকে নানাভাবে ছোট করেই বরং দেখানো হয়। ইসলামকে নিছক একটা ধর্ম হিসেবে পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ইসলামের সুমহান শিক্ষাগুলো খুব সংক্ষিপ্ত ও সীমিত পরিসরে মাধ্যমিক পর্যন্ত 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' নামে একটা পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরোপুরি অনুপস্থিত। অথচ ইসলাম যে সামগ্রিকভাবে মানুষের জীবনে বাস্তবায়নের জন্য এবং তাতেই যে প্রকৃত কল্যাণ রয়েছে এ শিক্ষার অনুপস্থিতির কারণেই আজ আমাদের সমাজ অনৈতিকতার সয়লাবে ছেয়ে যাচ্ছে।

বিভিন্ন ধারায় শিক্ষাব্যবস্থাঃ মাদ্রাসা শিক্ষা

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই ছিল একজন শিক্ষার্থীকে মন, মগজ, চিন্তাধারার দিক থেকে একজন পরিপূর্ণ মুসলিম হিসেবে এবং সমাজ পরিচালনায় দক্ষ ও যোগ্য হিসেবে তৈরী করা, কিন্তু প্রচলিত কারিকুলামে তার অনেকটাই অনুপস্থিত।

নতুন সিলেবাসে অত্যধিক চাপঃ

২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিকায়নের জন্য নতুন সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে। আগের বিষয়সমূহ অপরিবর্তিত রেখে নতুন কিছু বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। যেমনঃ

১। বাংলা ও ইংরেজী বিষয়ে ১০০ নম্বর করে বাড়ানো হয়েছে। এখন বাংলা ও ইংরেজী প্রত্যেকটিতে ২০০ নম্বার করা হয়েছে।

২। পূর্বে বিজ্ঞান বিভাগে গণিত ও জীববিদ্যা যে কোন একটি বিষয়ই কেবল নেয়া যেত, তাও অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে। নতুন সিলেবাস অনুযায়ী এখন দুটি বিষয়ই পড়তে হবে। একটা আবশ্যিক, আরেকটা ঐচ্ছিক। সুতরাং বিজ্ঞান বিভাগের জন্য এখানে একটি বিষয়ের দুটি পত্র মিলে আরও ২০০ নম্বর যুক্ত হলো।

৩। আর কমন আবশ্যিক বিষয় হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ১০০ নম্বর যোগ হয়েছে।

এর ফলে বর্তমান সিলেবাস অনুযায়ী আলিম পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিতে হবেঃ

- বিজ্ঞান বিভাগ- ১৭০০ নম্বর
- মানবিক বিভাগ- ১৫০০ নম্বর

যেখানে সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা সব বিভাগের জন্যই মোট নম্বর হলো ১৩০০। নতুন সিলেবাসে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের নামে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে, ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসা বিমুখ হচ্ছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের প্রতি বৈষম্যঃ

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনেক বিষয়েই মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বশেষ শিক্ষাবর্ষের নীতিমালা অনুযায়ী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ২৬টি বিভাগের মধ্যে ১৩ টিতেই ভর্তি হতে পারবে না। ১৯৯৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সর্বপ্রথম বাংলা ও ইংরেজী বিভাগে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিষিদ্ধ করে।

দেশের সর্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিনিয়তই বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। অথচ বাংলাদেশের সংবিধানে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা দেয়া আছে।

বিভিন্ন ধারায় শিক্ষাব্যবস্থাঃ মাদ্রাসা শিক্ষা

৮

আমাদের সংবিধানের ২৮(৩) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ঃ

"কেবল ধর্ম, বর্ণ, নারী, পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।"

এছাড়া সর্বশেষ প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ শিক্ষার ৩০টি "উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য" এর ৮ নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ

"বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ সুবিধা অবারিত করা, শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা।"

সংবিধান ও শিক্ষানীতিতে বৈষম্যহীন সমাজ তৈরীর কথা থাকলেও শুধুমাত্র মাদ্রাসায় পড়ার কারণে শিক্ষার্থীদের প্রতি বৈষম্য করা হচ্ছে। কিন্তু এত কিছুর পরও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা রেজাল্টের দিক থেকে প্রতি বছর শীর্ষস্থান দখল করে রাখছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে মেধা তালিকায় প্রথম স্থান সহ প্রথম বিশ জনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মাদ্রাসা শিক্ষার্থী। যে ইংরেজি বিভাগে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ দেয়া হয় না সে ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নম্বরের অধিকারীও থাকছে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা।

মাদ্রসা শিক্ষার দুটি ভাগঃ

তবে মাদ্রাসা শিক্ষার অনেক বড় একটা ত্রুটি হল এর মাঝেও দুটি ভাগ আছে। একটি আলীয়া অপরটি কওমী। আলীয়ার শিক্ষা কারিকুলামে সাধারণ শিক্ষার সাথে সমন্বয় করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের উপর পড়াশুনার অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। অপরদিকে কওমী অংশে সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত পড়াশুনার খুবই অভাব। ফলে কওমী অংশে পড়াশুনা করে শিক্ষার্থীরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ খুব কম পাচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে একটা নির্দিষ্ট কাঠামোতে নিয়ে এসে আরো সুচিন্তিত পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা খুব জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবঃ

বাংলাদেশের হাজার হাজার মাদ্রাসার মধ্যে মাত্র ৩টি মাদ্রাসা সরকারী। সরকারী মাদ্রাসাগুলোর সুযোগ-সুবিধা ও বেতনাদির বরাদ্দ না থাকায় মেধাবী শিক্ষকরা এখানে আসতে চায়না। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে মুসলিম শিক্ষার্থীরা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে নিঃশেষ হতে চলেছে।

প্রকৃতপক্ষে সমাজের অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। সমান সুযোগ পেলে এই মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরাই দেশ ও জাতির উন্নয়ন এবং দেশ পরিচালনায় দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারতো।

বিভিন্ন ধারায় শিক্ষাব্যবস্থাঃ

ইংলিশ মিডিয়াম

বাংলাদেশে ইংলিশ মিডিয়াম প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নেহায়েৎ কম নয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর কারিকুলাম সিলেবাস পাশ্চাত্যের দেশগুলোর শিক্ষা কারিকুলাম ও সিলেবাস অনুসারে তৈরী। সে দেশীয় শিক্ষাবিদগণ তাদের দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতিকে সামনে রেখেই এগুলো সাজিয়েছেন। ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির কোলে বেড়ে উঠা এ দেশীয় শিক্ষার্থীরা এ ধারার শিক্ষায় অভ্যস্ত হওয়ায় নিজ ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি স্বাভাবিক ভালোবাসা ও মমত্ববোধ হারিয়ে ফেলছে। খুব স্বাচ্ছন্দেই তারা স্বীকার করছে আমরা বাংলা বুঝিনা, পারিনা। বাংলা পড়তেও অনীহা প্রকাশ করছে। তাদের ধ্যান ধারণা, চিন্তা, জীবনবোধ, পোশাক পরিচ্ছদেও এর প্রভাব দেখা যায় সমানভাবে। এর দায় অবশ্য কোমলমতি এ শিক্ষার্থীদের দেয়া যায় না। এ সমস্যাগুলোর খুব সহজ সমাধান আমাদের হাতের কাছেই আছে। যেহেতু এ মাধ্যমের পড়াশুনা দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে আমরা কি পারি না আমাদের আদর্শ, আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির আলোকে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করতে? যে মাতৃভাষার জন্য আমরা প্রাণ দিয়েছি সে মাতৃভাষা শেখা ও চর্চার সুযোগটা ইংলিশ মিডিয়ামের শিক্ষার্থীদের পাওয়া উচিত নয় কি? তাছাড়া এ মাধ্যমে পড়াশুনা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় সুযোগটা শুধু উচ্চবিত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। চাইলেই কেউ পড়ার সুযোগ পাচ্ছেনা। সকলের জন্য শিক্ষার সমান অধিকারও এখানে লঙ্ঘিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

কারিগরি শিক্ষা

দেশকে সমৃদ্ধ করতে কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই। কারণ কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে স্বল্প সময়ে বিপুল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরিত করা সম্ভব। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অদক্ষ ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে বিদেশে প্রেরণ করায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যতখানি সমৃদ্ধি লাভের কথা ছিল, তার চেয়ে অনেক কম আমরা অর্জন করতে পারছি। অথচ কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণের মাধ্যমে খুব সহজেই দক্ষ ও যোগ্য জনবল তৈরী করা সম্ভব। উন্নত দেশগুলোর সাথে আমাদের অবস্থান পর্যালোচনায় দেখা গেছে, জাপানে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত জনবল ৬০ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৪০ শতাংশ, মালয়েশিয়ায় ৪২ শতাংশ আর সেখানে আমাদের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিগরি শিক্ষার অধীনে শিক্ষা গ্রহণরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭ শতাংশ মাত্র। তারপরও কথা থেকে যায়। এসএসসির ভোকেশনাল থেকে যেসব ছাত্রছাত্রী প্রতি বছর উত্তীর্ণ হচ্ছে তারা শুধু সার্টিফিকেটই অর্জন করছে। হাতে কলমে কিছুই শিখছে না। স্কুলের একটি শাখা হওয়ায় নিতান্তই অবহেলিত হচ্ছে এ সেক্টরের শিক্ষা। অপরদিকে সারা দেশে বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী মিলিয়ে প্রায় দুইশত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে যে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা চাহিদার তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। সেই সাথে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব, হাতে-কলমে শেখানোর অনাগ্রহ, নিয়মিত ক্লাস না হওয়া, রাজনৈতিক অস্থিরতা এ বিষয়গুলো এ সেক্টরে পড়াশুনার ফলপ্রসূতা অনেকখানি কমিয়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে কারিগরি শিক্ষার দিকে সংশ্লিষ্টদের আরো বেশি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

প্রাইভেট সেক্টরে শিক্ষা

বাংলাদেশের প্রাইভেট সেক্টরে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ আজ খুব সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অর্থের অসম লেনদেন চলছে।

প্রাইভেট স্কুলঃ সরকারি স্কুল গুলোর সাথে প্রাইভেট স্কুল গুলোর সিলেবাসের কোনো ভিন্নতা নেই। সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষার সুযোগ সুবিধার তেমন তারতম্য নেই। ভিন্নতা আছে কেবল ভর্তি ফি এবং বিভিন্ন টিউশন ফির। যদিও শিক্ষা অধিদপ্তর প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ফি নির্ধারন করেছেন সর্বাধিক ৫০০০ টাকা। অথচ দেশের বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখা গিয়েছে ১২৪০০ থেকে শুরু করে ৪৭০০০ টাকা পর্যন্ত নগদ ভর্তি ফি রাখা হচ্ছে। এছাড়া নিয়মিত বেতন, পরীক্ষা ফি, ভর্তি পরীক্ষায় চান্স না পেলে ডোনেশন ইত্যাদি বিভিন্ন ফির বিরাট অঙ্ক গুণতে হচ্ছে অভিভাবকদের। দেশের অধিকাংশ মানুষ যেখানে মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত সেখানে এ বড় অঙ্কের টাকা প্রদানে প্রতিনিয়তই অনেক পরিবারই পড়ছেন বিপাকে।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ২০১৪ সেশনে এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছে সত্তর হাজারেরও বেশী শিক্ষার্থী। অথচ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে আসন সংখ্যা সীমিত। তাই এসব শিক্ষার্থীরা নিতান্ত বাধ্য হয়েই ঝুঁকছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে। বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে। যদিও সুস্পষ্ট নীতিমালা ও তার প্রয়োগ না থাকায় যত্রতত্র গড়ে উঠছে অসংখ্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। যার মধ্যে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই ক্লাস, টিউটোরিয়াল পরীক্ষা কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। টাকা দিলেই মিলছে যে কোনো বিভাগের অনার্স ও মাস্টার্সের সার্টিফিকেট।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)র প্রতিবেদনে বলা হয়ঃ

"ক্লাস না করিয়ে ও পরীক্ষা না দিয়ে এবং ব্যবহারিক ক্লাস না নিয়ে টাকার বিনিময়ে সনদ প্রদান করা হচ্ছে। তাদের গবেষণায় জনপ্রতি ৩ লাখ টাকা করে নিয়ে এরকম একটি বিশ্ববিদ্যালয়েরই ৩০০ শিক্ষার্থীকে সনদ দেয়ার ঘটনা বেরিয়ে পড়েছে। বর্তমানে কেবল সার্টিফিকেট নির্ভর বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত হয়ে পড়েছে অন্তত ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়। পাঁচ/আট লাখ টাকায় মিলছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট।"

২০১৩ সালে প্রকাশিত ইউটিসির বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয় দেশের বেসরকারি ৬০ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১২ সালে মোট আয় করেছে ১৮৩৯ কোটি টাকা। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ গড় আয়ের পরিমান ৩১ কোটি টাকার বেশি অথচ একজন শিক্ষার্থীর পেছনে মাথাপিছু ব্যয় হয় ৮৭২৬৬ টাকা যা আয়ের তুলনায় খুবই কম। ২৬জুন ২০১৪ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে ১৯ পৃষ্টার তথ্য পাঠায় জাতীয় সংসদে। এতে অকপটে নানা ধরণের অনিয়ম, দুর্নীতির কথা উল্লেখ করেছে মন্ত্রণালয়।

মানগত দিক থেকে যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেলগুলো ভালো অবস্থানে আছে সেখানে চলছে অর্থের বাণিজ্য। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেলের সাথে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেলের ভর্তি ও টিউশন ফির পার্থক্য অনেক। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনার্সে ৫ থেকে ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত নেয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশের শিক্ষার বিভিন্ন মাধ্যমে এ মারাত্মক অসামঞ্জস্য আজ নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থের অঙ্কের উপর আজ পড়াশোনার মান নিশ্চিত হচ্ছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে অর্থ হলে পড়াশোনা না করেও স্কলার হয়ে যাচ্ছেন অনেকে। সমাজে শ্রেণী বৈষম্য এতে করে মারাত্মক আকার ধারণ করছে।

পরিবর্তিত হলো পাঠ্যসূচী

শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন

শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারছেনা। আর তাই চাহিদাকে সামনে রেখে শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং অনেক পরামর্শ ও গবেষণাও চালানো হয় যা সাধুবাদ পাবার মত। কিন্তু আমাদের হতাশ হতে হয় যখন আমরা দেখি কোন বিশেষ চিন্তাকে ধাবিত করা বা নির্দিষ্ট আদর্শকে প্রতিহত করার জন্য এ পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীসমূহ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত পাঠ্যপুস্তকে যে সব বিষয় সংযোজিত হয়েছে (ইতিহাস, বাংলা, সমাজ ও পরিবেশ বিজ্ঞান ইত্যাদি) তা শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারছে না।

আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় এমন অনেক বিষয়বস্তু আজ পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এমনি কয়েকটি বিষয় নিচে উল্লেখ করা হলো:-

ইতিহাস বিকৃতিঃ

বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসকে বিভিন্নভাবে এড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য "বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়" বইয়ে একটি অধ্যায়ের নাম "ইংরেজ শাসনবিরোধী আন্দোলন"। এখানে তিতুমীরের বিদ্রোহ সম্পর্কে তিনটি বাক্যে যা লিখা হয়েছে-"তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার গল্প এখনো মানুষের মুখে মুখে ঘোরে। ইংরেজ ও জমিদারদের শাসন ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে ভারতের পশ্চিম বাংলার চব্বিশ পরগনা জেলার নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। যুদ্ধরত অবস্থায় তিনি মারা যান।"

বৃটিশদের নিপীড়ন থেকে বাংলার মানুষকে মুক্তি দিতে তিতুমীরের আত্মত্যাগ এখনো মানুষকে প্রেরণা জোগায়। কিন্তু এখানে তিতুমীরের জীবনের আত্মত্যাগের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস যেমন আসেনি, তেমনি লাইনের শুরুতেই গল্প বলে এই আন্দোলনকে হালকা ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এমনকি তিনি শহীদ হন, না বলে তিনি মারা যান- এভাবে তার ত্যাগকে সাধারন মৃত্যুর মতোই তুলে আনা হয়েছে।

সপ্তম শ্রেণীর জন্য পাঠ্য "বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়" বইয়ে ভাষা আন্দোলন অধ্যায়ে লিখা হয়েছে "মাতৃভাষা অধিকারের জন্য এদেশে একাধিক উদ্যোগের কথা জানা যায়। এর মধ্যে

শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তনঃ পরিবর্তিত হলো পাঠ্যসূচী

১২

প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমন্বয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এর নেতৃত্বে ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে সক্রিয় ছিলেন কাজী গোলাম মাহমুদ, শওকত আলী, আজিজুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল মতিন, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ"। অথচ এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে ভাষা আন্দোলনের উদ্যোক্তা প্রসঙ্গে কোনো ব্যাক্তির কথা বলতে গেলে সবার আগে নাম আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর আবুল কাসেম এবং কোন সংগঠনের কথা বলতে গেলে অবশ্যই প্রথমে বলতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক সংগঠন তমদ্দুন মজলিসের নাম। অবশ্য পরবর্তীতে এ নামগুলো এসেছে।

- অষ্টম শ্রেণীর "বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়" বইয়ে আছে "২৬ শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষনা ছিলো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বঙ্গবন্ধু তার সেই স্বাধীনতার ঘোষনায় কি বলেছিলেন? তিনি বলেন, "এটাই হয়তো আমার শেষ কথা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে দখলদার বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করে চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত দেশবাসীকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।"

উপরে উল্লিখিত ভাষনের সাথে বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত ভাষনের মিল নেই।

- নবম-দশম শ্রেণীর জন্য পাঠ্য "বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা" বইয়ে মধ্যযুগে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস বিষয়ে ৪৩ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে- "বখতিয়ারের সাহস ও বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট হয়ে গুসামউদ্দীন তাকে বর্তমান মির্জাপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্বকোণে ভাগবত ও ভিউলি নামক দুটি পরগনার জায়গির দান করেন। এখানে বখতিয়ার তার ভবিষ্যৎ উন্নতির উৎস খুজে পান। বখতিয়ার অল্পসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করে পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য আক্রমণ ও লুণ্ঠন করতে শুরু করেন"।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর এম মোফাখখারুল ইসলাম বলেন "মধ্য প্রাচ্যের ইতিহাস আমি যতটুকু পড়েছি তাতে বখতিয়ার সম্পর্কে এমন তথ্য পাইনি।"

- মাধ্যমিকের বিভিন্ন শ্রেণীতে পলাশী যুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। যে পলাশী যুদ্ধের করুণ পরিণতিতে বাংলায় স্বাধীনতার সূর্য অস্ত গিয়েছিলো, যার ফলে দীর্ঘদিনের জন্য এ জনপদের মানুষ ব্রিটিশদের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছিল সে পলাশী যুদ্ধের ইতিহাস কোনো শ্রেণীর পাঠ্য বইতেই সুন্দর ভাবে আসেনি। অনেকটা বিক্ষিপ্ত আকারে বিভিন্ন শ্রেণীর বইতে এসেছে।

প্রকৃত ইতিহাসকে এড়ানো হয়েছে প্রতিটি শ্রেণীতেই। কোন জাতির ইতিহাস যখন দলীয় সংকীর্ণ চিন্তাভাবনার কারণে বার বার পরিবর্তন হয় তা সত্যিই সে জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক।

অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশঃ

- মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্যে (নবম শ্রেণী) পয়লা বৈশাখ সম্পর্কে কবীর চৌধুরী বলেছেন, "বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব বাংলা নববর্ষ উদযাপন আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাকে অপরাজেয় শক্তি ও মহিমায় পূর্ণ করুক। এই হোক আমাদের শুভ কামনা। জয় পয়লা বৈশাখ।"

Bangladesh Islami Chhatrisangstha
http://www.islamichhatrisangstha.org

শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তনঃ পরিবর্তিত হলো পাঠ্যসূচী

- একই প্রবন্ধের পাঠ পরিচিতিতে বলা হয়েছে "বাংলা নববর্ষ পয়লা বৈশাখ বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।"

পয়লা বৈশাখ যে সংস্কৃতির অনুসরণে উদযাপন করা হয়, তা মুসলিমদের আদর্শ ও জাতীয় চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মের আচার রীতিতে পালন করা পয়লা বৈশাখকে আমাদের সার্বজনীন উৎসব বলা হয়েছে।

ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণাঃ

ইসলাম ধর্ম বইগুলোতে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা দেবার পরিবর্তে এটিকে অন্যান্য ধর্মের সমপর্যায়ের আনুষ্ঠানিক অনেকটা আচার সর্বস্ব ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

- অষ্টম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইতে বলা হয়েছে:- "এক কথায় ক্ষমাশীলতা, উদারতা, সততা ও সত্যবাদিতা, সংযম, ন্যায়পরায়ণতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমত সহিষ্ণুতা, মানবিকতা, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, দানশীলতা, পরোপকার, দেশপ্রেম ও ওয়াদা পালন সহ অনুসরণীয় গুণাগুণ রাসূল (সা:) এর জীবনে ছিল।"

চিহ্নিত গুণাবলীগুলো কি উদ্দেশ্যমূলকভাবেই পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে?

অনৈতিকতার প্রশিক্ষণঃ

- ৬ষ্ঠ শ্রেণীর গার্হস্থ্য অর্থনীতি বইতে পঞ্চম অধ্যায়ে "কৈশোর কালীন বিকাশ" শিরোনামে কৈশোর কালীন সময়ে শারীরিক পরিবর্তন সম্পর্কে এমন কিছু বিষয়কে তুলে আনা হয়েছে যা এখানে প্রকাশ করা যাচ্ছে না।

এছাড়া অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক বই "নিজেকে জানা" দেয়া হয়েছে। কিশোর কিশোরীদের জন্য রচিত এ বইয়ে নারী পুরুষের বিভিন্ন বিষয় এমন খোলামেলাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা এখানে প্রকাশ যোগ্য নয়। উক্ত বইয়ে কৈশোরকালীন প্রতিটি পরিবর্তন, নারী-পুরুষের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

- অষ্টম শ্রেণীর "বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়" বইয়ে বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "যেসব কাজ কিশোর অপরাধের পর্যায়ে পড়ে সেগুলো হচ্ছে চুরি, খুন, জুয়া খেলা, স্কুল পালানো, বাড়ি থেকে পালানো, পরীক্ষায় নকল করা, বিদ্যালয় ও পথেঘাটে উশৃঙ্খল আচরণ, পকেটমারা, মারপিঠ করা, বোমাবাজি, গাড়ি ভাংচুর, বিনা টিকেটে ভ্রমন, পথে ঘাটে মেয়েদের উত্যক্ত করা, এসিড নিক্ষেপ, নারী নির্যাতন, পর্ণো বা নোংরা ছবি দেখা, মাদক গ্রহণ ইত্যাদি।

আরও বলা হয়েছে, "পর্ণোগ্রাফি, ব্লুফিল্ম ও বিভিন্ন অশ্লীল প্রকাশনা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিতে হবে"। চিহ্নিত শব্দগুলোর সাথে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পরিচিত করানো কি খুব জরুরী?

কৈশোর কালীন বিকাশ সাধনের এ সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তকে এ ধরনের অনৈতিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা এবং এমন কিছু অপরাধের সাথে পরিচিত করানো হচ্ছে যে অপরাধগুলি সামাজিকভাবে কম পরিচিত।

পাঠ্যপুস্তকে নৈতিকতার বদলে অনৈতিক শিক্ষা দেয়া, ইতিহাসকে বার বার বদলে দেয়া, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ বিনষ্ট করার মাধ্যমে এ দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করার পরিবর্তে ভুল পথেই বেশি নেয়া হচ্ছে। যার ভয়াবহ চিত্র আজ সমাজে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

Bangladesh Islami Chhatrisangstha
http://www.islamichhatrisangstha.org

সহশিক্ষাঃ
নৈতিকতা বিনাশী এক নীরব ঘাতক

১৪

আমাদের দেশে একটা সময় নারীশিক্ষা শুধুমাত্র গৃহেই সীমাবদ্ধ ছিল। বেগম রোকেয়ার মতো কিছু ব্যাক্তির আন্দোলনে নারীশিক্ষার প্রচলন হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় মেয়েদের জন্য আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গাড়িতে করে মেয়েরা স্কুলে যেতো। সময়ের বিবর্তনে, যুগের আধুনিকতার ছাপ শিক্ষা ব্যবস্থার উপরও এসে পড়েছে। এখন আর পর্দার মধ্যে নয়, খোলামেলা ভাবেই ছেলেদের সাথে সমান তালে মেয়েরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করছে। শুধু স্কুল,কলেজ,বিশ্ববিদ্যালয় নয়, মাদরাসাতেও এখন সহশিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হচ্ছে। সহশিক্ষা এখন আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু একটু নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করলে সহশিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে,নাকি নেতিবাচক তা সহজেই আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একটি বিষয় আমরা যে কেউ-ই মানতে বাধ্য হব যে, নারী এবং পুরুষের দৈহিক গঠন, মানসিক অবস্থা আলাদা। আর নারী ও পুরুষকে আল্লাহ্ এমন ভাবেই সৃষ্টি করেছেন, উভয়ের প্রতি পারস্পরিক আকর্ষণবোধ থাকবেই। কিন্তু এই আকর্ষণবোধকে নৈতিকতার সীমার মধ্যে রাখা জরুরী, তা না হলে একটি চতুষ্পদ জন্তুর সাথে মানুষের আর পার্থক্য থাকেনা। নারী ও পুরুষের একই কর্মক্ষেত্র হলে, উভয়েরই মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় এটা বৈজ্ঞানিক ভাবেই পরীক্ষিত সত্য। যার কারণে যেকোনো ক্ষেত্রেই অনৈতিকতার অনুপ্রবেশ ঘটে অনেক সহজে। আর শিক্ষাক্ষেত্রে পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট হয় অনেকাংশেই এই সহশিক্ষার প্রভাবে।

মহান রাব্বুল আলামিন মানুষের মধ্যে অনৈতিকতার অনুপ্রবেশ ঠেকাতেই পর্দার বিধান নাযিল করেছেন এবং অবাধ মেলামেশাকে নিষিদ্ধ করেছেন। সূরা নূরের ৩০-৩১ নং আয়াতে মুমিন নারী ও মুমিন পুরুষ উভয়কেই দৃষ্টি সংযত করতে বলা হয়েছে, নারীদের স্বীয় সৌন্দর্যকে প্রদর্শন করতেও নিষেধ করা হয়েছে। অথচ সহশিক্ষার মধ্য দিয়ে এই বিধানগুলো লঙ্ঘনের অবাধ সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। যদি বলা হয় শিক্ষার আধুনিকায়নে অথবা শিক্ষার প্রসারেই এই সহশিক্ষার প্রচলন তাহলে বলতে হয় নৈতিক স্খলন ছাড়া সহশিক্ষা আমাদের আর কি উপহার দিচ্ছে? যেখানে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে উন্নত নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন মানুষ তৈরি, সেখানে অনৈতিকতার বীজবাহক এই ব্যবস্থা আদৌ কি পারে কাঙ্ক্ষিত মানুষ উপহার দিতে?

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার তৈরী বর্তমান প্রজন্ম ঃ

কি উপহার দিল সমাজ ও দেশকে?

১৫

একটি শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন ঘটে জাতির নীতি নৈতিকতা, মানুষের সামাজিক আচরণ, জাতীয় উন্নতি সহ সামগ্রিক অবস্থায়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে স্বাক্ষরতা ও শিক্ষার হার দিন দিন বাড়ছে। সেই সাথে শিক্ষার অবকাঠামোগত উন্নয়নও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার মান কতটা বাড়ছে, সমাজে তার কতোটা প্রভাব পড়ছে সেটাই ভেবে দেখার বিষয়। বিগত বছর গুলোতে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র রাজনীতি, আধিপত্য বিস্তার, আভ্যন্তরীণ কোন্দলকে কেন্দ্র করে ১৪৭ জন ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। আহত হয়েছে ৪ হাজার ১৪৫ জন। সংঘর্ষের কারণে অন্তত ৬০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল।

ছাত্র রাজনীতি নাকি অপরাজনীতিঃ

ছাত্রদের অপরাজনীতি থেকে মুক্তি পাচ্ছেনা শিক্ষকসহ সাধারণ ছাত্রীরাও। ছাত্র রাজনীতির আভ্যন্তরীণ কোন্দলসহ বিভিন্ন ঘটনায় শিক্ষকদের লাঞ্ছিত ও নির্যাতন করা হচ্ছে। সাধারণ শিক্ষার্থীরাও এদের কাছে অনেকটা জিম্মি হয়ে পড়েছে। আবার বিভিন্ন সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে প্রাণ দিতে হচ্ছে অনেক সাধারণ শিক্ষার্থীদের। বিগত বছরগুলোতে ঢাবি, জাবি, চবি, রাবি, কুবি, ইডেন কলেজ, ঢাকা কলেজ সহ বিভিন্ন জেলা ও শহরে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের হাতে দুই শতাধিক সাংবাদিক লাঞ্ছিত হয়েছে।

টেন্ডার ও চাঁদাবাজিঃ

দেশের প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শহরে চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজিতে ছাত্ররা জড়িয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে শিক্ষা ভবন, গণপূর্ত ভবন, খাদ্য ভবন থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার টেন্ডার হাতিয়ে নেয়। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র নেতারা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি নিয়ে কয়েক বার সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় ঢাবি, জাবি, রাবি, চবিসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন জেলা শহরের বিশাল পরিমাণ বাজেটের উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ বন্ধ রাখা হয় এবং ৬৫৫ কোটি ১২ লাখ টাকার উন্নয়ন প্রকল্প হাতিয়ে নেয়া হয়।

ভর্তি ও নিয়োগ বাণিজ্যঃ

মেডিকেল, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ভর্তি এবং বিভিন্ন চাকরিতে নিয়োগ বাণিজ্য প্রায় প্রকাশ্যেই করা হয়। এক একজন প্রার্থীর কাছ থেকে এক থেকে দশ লাখ টাকা পর্যন্ত নেয়া হয়। অনার্স ভর্তিতে বিভিন্ন কলেজের প্রশাসনকে জিম্মি করে ছাত্রলীগ কোটার নাম করে হাজার হাজার ছাত্র ভর্তি করা হয়।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার তৈরী বর্তমান প্রজন্ম ঃ কি উপহার দিল সমাজ ও দেশকে?

শিক্ষক সমাজে দলীয়করণঃ

শুধু ছাত্র রাজনীতিই নয় শিক্ষক রাজনীতিও বর্তমান শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতার অন্যতম প্রধান কারণ। শিক্ষকরা যেখানে ছাত্রদের আদর্শ ও নৈতিকতার পথ দেখাবেন সেখানে শিক্ষকদের রাজনীতি, ভিসি নিয়োগ কেন্দ্রিক অস্থিরতা, দলীয় ভাবে শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি কারণে দিন দিন শিক্ষকদের অবস্থান তাদের আদর্শ ও মূল লক্ষ্য থেকে সরে আসছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস গুলোতে এখন শিক্ষকদের সহাবস্থান নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন, শিক্ষক কোন্দল, অন্তঃকোন্দল ইত্যাদি কারণে ভিসি প্যানেল নির্বাচন, ডাকসু নির্বাচন দীর্ঘ দিন ধরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিই শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাচ্ছে। দলীয় আধিপত্য বিস্তার, অন্তঃকোন্দলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, সন্ত্রাসী, অস্ত্র ও বোমাবাজি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ছিনতাই, হত্যা নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোন কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। ফলে এক শ্রেণীর শিক্ষার্থীর হাতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা জিম্মি হয়ে পড়েছে। প্রতিনিয়তই এর বলি হয়ে কেউ প্রাণ হারাচ্ছে আর কেউ সম্মান হারাচ্ছে।

ভিসি পদত্যাগ সংকটঃ

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এ ভিসি পদত্যাগের দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন হয় এবং ক্লাস, পরীক্ষা বন্ধ থাকে। বুয়েটের দীর্ঘ দিনের সুনাম নষ্ট হবার উপক্রম। আইন এবং স্বাতন্ত্র্য অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়াও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগকে কেন্দ্র করে বারবারই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে শিক্ষক ও প্রশাসন। সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মক ভাবে বিনষ্ট হচ্ছে। ফলে সেশন জট বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভিসি কেন্দ্রীক জটিলতার অন্যতম কারণ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভিসি প্যানেল নির্বাচন হচ্ছেনা। ঢাকা, জাহাঙ্গীর নগর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় তেহাত্তরের আদেশে। এই আদেশের ১২ ধারার ১ থেকে ৮ উপধারায় ভিসির ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে বলা আছে। ১নং উপধারায় বলা হয়েছে, "ভিসি সব সময়ের জন্য প্রশাসনিক এবং একাডেমিক প্রধান কর্তা হবেন। একই সঙ্গে তিনি সিনেট, সিন্ডিকেট এবং একাডেমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হবেন।

নৈতিক শিক্ষা বর্জিত এই শিক্ষাব্যবস্থা কেবলমাত্র আমাদের অজস্র ডিগ্রীধারী তথাকথিত স্কলার ও মেধাবী মানুষ উপহার দিচ্ছে, কিন্তু কল্যাণের ধারায় সমাজ পরিবর্তনের কোন কারিগর দিচ্ছে না। যখন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ও প্রথিতযশা শিক্ষককে অযাচিত অনৈতিক আচরণের কারণে বরখাস্ত হতে হয় অথবা কোন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিকেই দেখা যায় ঘুষ, দুর্নীতির সাথে জড়িত, তখন সত্যিই প্রশ্ন জাগে, তথাকথিত এই আধুনিক বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে উন্নত প্রাণী ছাড়া সত্যিকারের মানুষ কি বানাতে পেরেছে?

Bangladesh Islami Chhatrisangstha
http://www.islamichhatrisangstha.org

বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ছাত্র রাজনীতির ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন এবং ১৯৬৯ এর গন অভ্যুত্থান, ১১ দফার আন্দোলন, স্বায়ত্বশাসনের স্বপক্ষে সংগ্রাম, সর্বোপরি ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম। ছাত্রসমাজ শোষন, নির্যাতন, নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নিয়োজিত করে।

ছাত্ররাই এ দেশ ও জাতির বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নে সাহসী ও সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছে।

একসময় ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হত।

প্রায় দুই যুগ ধরে দেশের কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। সর্বশেষ ১৯৯৪ সালে ডাকসু, ১৯৯২ সালে জাকসু, ১৯৮৯ সালে রাকসু ও ১৯৯০ সালে চাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন না থাকায় তা নেতৃত্ব বিকাশের অন্যতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, *"১৯৯০ পরবর্তী সময়ে আমাদের রাজনীতিতে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেনি। কারণ রাজনৈতিক দলগুলোতে গণতন্ত্রের চর্চা নেই। কাউন্সিলের মাধ্যমে ছাত্র সংগঠন গুলোতে নেতৃত্ব গঠন করা হচ্ছেনা। পাশাপাশি ছাত্র সংসদ নির্বাচন না থাকায় বড় দুই দলের বাইরে থেকে নতুন নেতৃত্ব বেরিয়ে আসছে না। আর এ কাজটি করা হচ্ছে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে যারা থাকেন তারাও রাজনৈতিক ভাবে অবস্থান করেন। তিনি বলেন, এখন রাজনীতি সংঘাত ও ক্ষমতা নির্ভর হয়ে পড়েছে। দেশপ্রেমের রাজনীতি এখন আর নেই। ফলে রাজনীতির চর্চা যেমন হচ্ছেনা, তেমনি মেধাবীরা রাজনীতির প্রতি অনীহা প্রকাশ করছেন, ভীত হয়ে পড়ছেন, যার ফলে নেতৃত্বের বিকাশ ব্যহত হচ্ছে। রাজনীতি হচ্ছে কেন্দ্রীভূত"*।

(সূত্রঃ দ্যা রিপোর্ট)

Bangladesh Islami Chhatrisangstha
http://www.islamichhatrisangstha.org

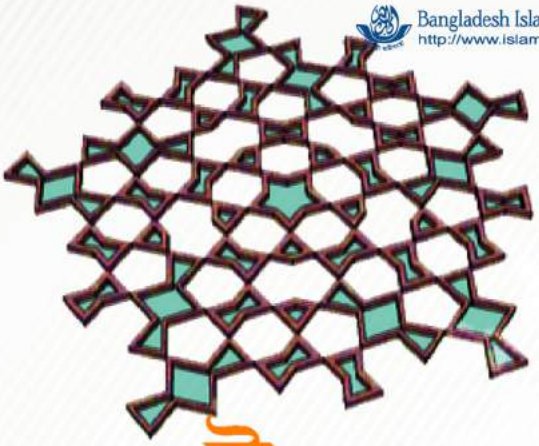

ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা

১৮

ইসলাম শব্দের অর্থ আনুগত্য করা, কোন কিছু মাথা পেতে নেয়া। ইসলাম শব্দের মূল ধাতু "সালামুন" এর অর্থ শান্তি এবং সন্ধি। পারিভাষিক অর্থে একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল প্রদর্শিত জীবন পদ্ধতি অনুসরণ করা এবং এর বিপরীত সমস্ত মত ও পথ পরিহার করে চলাকেই বলা হয় ইসলাম। আর যে শিক্ষা শিক্ষার্থীদের এই জীবন পদ্ধতি শিক্ষা দেয় সংক্ষেপে তাই ইসলামী শিক্ষা। ব্যাপক অর্থে ইসলামী শিক্ষা হলো সেই শিক্ষা যা -

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ঃ সময়ের দাবী

১৯

সার্বিক শিক্ষার এবং তার ফলপ্রসূতার ব্যাপারে সমাজের কারো কোনো পেরেশানির কমতি নাই। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন পাঠ্যসূচীতে মানুষের নৈতিক কিছু দিকের ব্যাপারেও শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতাসহ এমন বহু কল্যাণকর দিক গ্রহণ ও অনাচার হতে বিরত থাকার কথা পাঠ্যক্রমেই অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু বাস্তব কোন প্রতিফলন কি আমরা দেখতে পাই? সদ্য পাশ করে বের হওয়া শিক্ষার্থী ঘুষ দিয়ে তার চাকুরী শুরু করছে। আজ অন্যায়, অনাচার, অনৈতিকতার সয়লাবে ভেসে যাওয়া এই সমাজের চিত্র এ কথা আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেয় যে, প্রচলিত বস্তুগত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মানব সত্তার দুটি দিকের একটি - অর্থাৎ জৈবিক সত্তা (matter) কে উন্নত করতে পারলেও, মানব সত্তার মূল নৈতিক সত্তার (আত্মা বা spirit) উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের উন্নয়নের কাজটি করার ব্যাপারে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা আজ ব্যর্থ। প্রয়োজনীয় পাঠ্যসূচী সবই তো আছে। তাহলে সমস্যা আসলে কোথায়? সমস্যা- তার বাস্তবায়নের মানসিকতায়, যা কোরআনের আদর্শকে ধারণ করা ছাড়া একটি মানুষের ভিতর তৈরী হতে পারে না। ইসলাম যখন আদর্শ হিসেবে আরবে প্রবেশ করল তখন নিয়ম কানুন, আইন বাস্তবায়ন এবং অন্যায় হতে মানুষকে দূরে রাখার জন্য কোন পুলিশের প্রয়োজন ছিল না। আদর্শের প্রভাবই যথেষ্ট ছিল। এ কারণেই আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষার ফলে মদ্যপান, ব্যভিচার সহ অনেক কঠিন বিষয়ের সহজ সমাধান আমরা খুঁজে পাই।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য

২০

কুরআন ও হাদীসে আমরা ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য সরাসরি পাই-

" এই জ্ঞান লাভ করো যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। "- (সূরা মুহাম্মদ:১৯)

" আমি আমার রাসূলদেরকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়ে পাঠিয়েছি। সেই সাথে তাদের কাছে অবতীর্ণ করেছি কিতাব এবং মানদন্ড; যাতে করে মানুষ সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।" -(সূরা হাদীদ : ২৫)

"যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের কোন পথ অবলম্বন করে, তার দ্বারা আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জন্যে জান্নাতের একটি পথ সহজ করে দেন। যেখানে কিছু লোক আল্লাহর একটি ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পড়ে এবং নিজেদের মধ্যে তার মর্ম আলোচনা করে তাদের উপর নেমে আসে প্রশান্তি, আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে দেয়, ফেরেশতাগণ তাদের পরিবেষ্টিত করে রাখে। তাছাড়া আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের নিকট তাদের কথা আলোচনা করেন। যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, বংশমর্যাদা তাকে এগিয়ে নিতে পারেনা।"

- (সহীহ মুসলিম)

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্যঃ

- শিক্ষার্থীদের আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ ও আখিরাতে জবাবদিহিতার চেতনা তৈরীর মাধ্যমে পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে তৈরী করা।
- সময় ও সমাজের চাহিদার প্রেক্ষিতে দক্ষ, জীবন ও কর্মমুখী, সৎ, চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বস্ত, উদ্যমী ও সাহসী মানুষ সৃষ্টি করা।
- সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যথাযোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করা।
  জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা।
- যুগের চাহিদা মাফিক দক্ষ ও যোগ্য গবেষক, আবিষ্কারক, চিন্তাবিদ, লেখক, বিচারক, শিক্ষক, সৈনিক, সমাজ সংস্কারক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, চিকিৎসক, প্রকৌশলীসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি বিধান এবং সকল ক্ষেত্র ও বিভাগ পরিচালনার উপযুক্ত লোক তৈরী করা।
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর মেধা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ নিশ্চিত করা।

মূলত এটি আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা। তাই যে কেউ তার আদর্শের প্রতিফলন সমৃদ্ধ একটি বাস্তব ভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ এই অবস্থায় পেতে পারে।

Bangladesh Islami Chhatrisangstha

একজন শিক্ষক এসে পথ দেখালেন

২১

একজন সফল শিক্ষক তিনিই যিনি তার আদর্শ ও শিক্ষার আলোকে শিক্ষার্থীদের চিন্তা, মানসিকতায় পরিবর্তন সাধন করতে পারেন। মুহাম্মদ (সা:) কে শুধুমাত্র একজন ধর্মপ্রচারক হিসেবে গণ্য করার সুযোগ আসলেই নেই। কারণ তিনি কুরআনের যে শিক্ষা প্রচার করেছেন তা মানুষের কাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত পরিবর্তনে পুরোপুরি সফল ছিল। যা একটি সার্থক শিক্ষা ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য। আরবের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ থেকে তিনি আলোকিত কিছু মানুষকে তৈরী করতে পেরেছিলেন। তিনি শুধু নৈতিক সংশোধনই নয় বরং একজন পরিপূর্ণ শিক্ষক হয়ে অন্ধকার সমাজের আবর্জনা ও কুসংস্কার দূর করে সুবিচার ও ভারসাম্যপূর্ণ সামাজিক কাঠামো তৈরী করেন।

এক্ষেত্রে রাসূল (সা:) এর যে দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশেষ উদ্যোগগুলো আমরা দেখি-

শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপঃ

রাসূল (সা:) একটি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাশাপাশি একটি অজ্ঞ ও অশিক্ষিত সম্প্রদায় বিদ্যমান থাকার বিষয়টি কোনোভাবেই মেনে নেননি। অজ্ঞ মূর্খরা তাদের মূর্খতার উপর বিদ্যমান থাকা এবং শিক্ষিতরা তাদেরকে শিক্ষাদান না করা-দুজনের কাজই আল্লাহর নির্দেশ ও শরীয়তের পরিপন্থী বলে গণ্য করেন তিনি।

নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনাঃ

তিনি নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেন। বদর যুদ্ধে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ হিসেবে দশজন নিরক্ষরকে লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব দেন। একটি সম্প্রদায়ের অজ্ঞতা দূর করার জন্য সম্প্রদায়টিকে এক বছর সময় দেন তিনি।

Bangladesh Islami Chhatrisangstha

Bangladesh Islami Chhatrisangstha
http://www.islamichhatrisangstha.org

একজন শিক্ষক এসে পথ দেখালেন

২২

রাসূল (সা:) এর সময়কালের শিক্ষাকেন্দ্রসমূহঃ

জ্ঞান অর্জনের প্রতি রাসূল (সা:) এর অব্যাহত গুরুত্বারোপের ফলে তাঁর সময়কালেই বেশ কিছু শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। মাক্কী যুগের শিক্ষা কেন্দ্র সমূহের মধ্যে দারুল আরকাম শিক্ষাকেন্দ্র, ফাতিমা বিনতে খাত্তাবের শিক্ষাকেন্দ্র ও মাসজিদে আবু বকর (রা:) কেন্দ্রিক শিক্ষাকেন্দ্র বেশ উল্লেখযোগ্য। মাদানী যুগে শিক্ষাকেন্দ্র গুলো আরো বিস্তৃত হয়। যার মধ্যে মসজিদে কুবার শিক্ষাকেন্দ্র, গামিম শিক্ষাকেন্দ্র, নাকী আল-খাদিমাত শিক্ষালয়, কুরআনের নৈশ শিক্ষালয় জ্ঞান বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে রাসূল (সা:) এর সাহাবীগণের পদক্ষেপসমূহঃ

রাসূল (সা:) এর উদ্যোগগুলো পরবর্তী খলিফাদের সময়কালে আরো বেশী বিস্তৃত হয়। এক্ষেত্রে উমর(রা:) যে সুন্দর পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেন তা হল-

১। শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় চালু করেন।

২। তিনি শাম, বসরা, কুফাসহ বিভিন্ন নগর ও জনপদে শিক্ষিত সাহাবীগণকে শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করেন।

৩। তাঁর সময়কালে শিক্ষা লাভ ও জ্ঞান অন্বেষনের উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত ভ্রমণ এবং অঞ্চল থেকে অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানোর ব্যাপক প্রথা চালু হয়।

রাসূল (সা:) এর শিক্ষাদান পদ্ধতিঃ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

"আমরা তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। সে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবনকে বিশুদ্ধ ও বিকশিত করে। তোমাদের আল কিতাব শিক্ষা দেয়, কর্মকৌশল শিক্ষা দেয়, আর তোমরা যা কিছু জানতে না, তা তোমাদের জানিয়ে দেয়।"

- (সূরা বাকারাঃ ১৫১)

কুরআনের আলোকে আমরা রাসূল (সা:) এর শিক্ষাদান পদ্ধতির যে মৌলিক দিকগুলো লাভ করি সেগুলো হলঃ

- রাসূল (সা:) মানুষকে কুরআনের শিক্ষা দিতেন।
- তাদের জীবনকে বিশুদ্ধ ও বিকশিত করতেন।
- মানুষের ধ্যান ধারণা, চিন্তা চেতনাকে সংশোধন করার শিক্ষা দিতেন।

কন্যা সন্তান হত্যা নিষিদ্ধ, দাস ও অবহেলিত শ্রেণীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, নারীদের মর্যাদা ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠাসহ একজন পূর্ণাঙ্গ শিক্ষক হিসেবে তিনি যে পথ দেখান আমাদেরকে তার কোনো বিকল্প আমরা খুঁজে পাই না। এমন শিক্ষকের অনুসরণই কাম্য।

Bangladesh Islami Chhatrisangstha
http://www.islamichhatrisangstha.org

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

এ শিক্ষাব্যবস্থা এক সাথে দ্বীনী ও দুনিয়াবী প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হবে। তাই ইসলামের যে মৌলিক জ্ঞানগুলো একজন মুসলিম হিসেবে জানা ফরয সেগুলো শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিটি স্তরের মূলভিত্তি হিসেবে থাকবে। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিদ্যা, কারিগরী, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে কোন পর্যায়ে কতটুকু বা কি পড়ানো হবে তা প্রয়োজনের আলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সেগুলো এই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা হচ্ছে না। এখানে শুধু ইসলামের মৌলিক জ্ঞানগুলোর রূপরেখা উপস্থাপন করা হলো-

প্রাথমিক স্তর:-

ইসলামী আকীদার মৌলিক ধারণাগুলো যেমন: তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত এই বিষয়গুলোর প্রাথমিক ধারণা স্পষ্ট করার মত শিক্ষা দিতে হবে।

নবী-রাসূল ও সাহাবীদের জীবনী থেকে নিয়ে ইসলামী জীবনাচরণ ও মৌলিক ইবাদতের নিয়ম সংশ্লিষ্ট জ্ঞান প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

তাজবীদসহ সহীহ করে কুরআন তিলাওয়াত করার যোগ্যতা তৈরী করতে হবে।

মাধ্যমিক স্তর:-

ঈমান, ইসলামের মৌলিক আকীদাগত দিক সমূহের ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে শিক্ষার্থীরা অবহিত হবে। এই আকীদা-বিশ্বাসের যুক্তি-প্রমাণ কি, প্রয়োজন কি, মানার গুরুত্ব কি, কর্মজীবনে এসবের প্রভাব কিরূপ তার বিস্তারিত বর্ণনা থাকবে।

ইসলামী নৈতিকতার ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণধর্মী শিক্ষা থাকবে।

ইসলামী ইতিহাসের সঠিক জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা থাকবে।

উচ্চ শিক্ষা:-

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ছাত্র নিজ বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেই বিষয়ে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করবে। সেই সাথে সাধারণভাবে ৩টি বিষয়ে গবেষণাধর্মী পাঠদান থাকতে পারে-

কুরআন: অনুবাদ ছাড়া কুরআন বুঝার যোগ্যতা সৃষ্টি করা। কুরআনের শিক্ষা কি-তা ভাল করে জানা ও বুঝার যোগ্যতা সৃষ্টি করা।

হাদীস সংকলন: কুরআনের নির্দেশগুলোর বাস্তব অনুশীলনের সর্বোত্তম উদাহরণ হিসেবে রাসূল (সা:) এর জীবনের সামগ্রিক দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

ইসলামী জীবন পদ্ধতি: ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস থেকে শুরু করে ইবাদাত, আখলাক, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতিসহ ইসলামী জীবন বিধানের যাবতীয় দিক ও মানব জীবনে এর প্রভাব যুক্তি-প্রমাণাদি সহ থাকবে।

বিশেষ পর্যায়ের শিক্ষা:-

কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, আরবী সাহিত্য তুলনামূলক ধর্ম অধ্যয়ন ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চমানের গবেষণাধর্মী ও বিশ্লেষণধর্মী শিক্ষা থাকবে, যা এই বিষয়সমূহে ইজতেহাদী (গবেষণা) যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ তৈরী করবে।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার উপহার:

সেরা মানুষ, সেরা যুগ

২৪

বর্তমান সমাজে অন্যায়-অনাচারের মাত্রাতিরিক্ত আধিক্য দেখে জাতি আজ শংকিত। অপ্রিয় সত্য কথা হল, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সভ্য সমাজেই প্রতিনিয়ত নারী ও শিশু নির্যাতনের হার বেড়েই চলেছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জরিপে দেখা গেছে, দেশের বিবাহিত নারীদের ৮৭.৭% কোন না কোন সময়ে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। মহিলা পরিষদের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৩ সালে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৪,৭৭৭টি। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালের জানুয়ারী - জুন এই ছয় মাসে সারা দেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনায় অন্তত ১০ হাজার মামলা হয়েছে। প্রকৃত সংখ্যা যে আরো অনেক বেশি তা সহজেই অনুমেয়।

অস্থিরতার এই ক্রান্তি লগ্নে যখন আমরা চারদিকে দৃষ্টি দেই, তখন দেখি যেন অন্ধকারের এক অথৈ সমুদ্র সর্বদিক থেকে আমাদের ঘিরে রেখেছে। এই মহা সমুদ্রে অনেক দূরে, চৌদ্দশ বছরের দূরত্বে একটি উজ্জ্বল আলোর বিন্দু জ্বল জ্বল করতে দেখতে পাই। এই আলো আর কিছু নয়, মানবতার ত্রাণকর্তা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সময়কার ইসলামী শিক্ষায় আলোকিত সমাজ। যে সমাজের সদস্য হযরত আবু বকর(রা:), হযরত উসমান (রা:), হযরত উমর (রা:), হযরত আলী (রা:) এর মতো সোনালী মানুষেরা। যে সমাজের মানুষেরা সত্য প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে প্রাণ দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতো না। যে সমাজের সদস্যরা নিজেদের ক্ষতি স্বীকার করেও ওয়াদা পূরণে বিচলিত হতো না, যেখানে নিজে না খেয়ে বন্দীকে খাওয়ানো হতো, নিজের প্রাণ সংহারকারী শত্রুকেও হাতের নাগালে পেয়ে ক্ষমা করে দেয়া হতো। যে সমাজে দরিদ্র মানুষকে দান করার এতো তীব্র প্রতিযোগিতা হতো, যে দান করার মতো দরিদ্র মানুষই আর খুঁজে পাওয়া যেতো

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার উপহারঃ সেরা মানুষ, সেরা যুগ

না যে সমাজের অধিপতিরা আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয়ে দিনের পর দিন অনাহারে থাকতেন, তবুও রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে একটি টাকাও নিতেন না। যেখানে মৃত্যুদন্ড পাওয়ার মতো অপরাধ করে এসে অপরাধী আইনের কাছে নিজ থেকে আত্মসমর্পণ করে নিজের বিচার প্রার্থনা করতে পারে, সেই সমাজকে পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম সমাজ না বলে কি উপায় আছে ?

এই সোনালী যুগের মানুষের মধ্যে আমরা দেখি, আল্লাহ ভীরুতা ও সততার উৎকৃষ্ট নমুনা। যে সময়ে মা মেয়েকে দুধে পানি মিশানোর জন্য উৎসাহিত করার পর মেয়ের উত্তর হয় "আল্লাহ তো দেখছেন"। যে সমাজের শাসক হযরত উমর (রা:) কে আমরা দেখি, নিজের সন্তানকেও মদ্যপানের অভিযোগে কঠিন শাস্তি নিজ হাতে দিতে, যার ফলে সেই সন্তান মৃত্যু বরণ করে। তারপরও তিনি নিজ সন্তান বলে তাকে ক্ষমা করেননি। আর এই সমাজের শ্রেষ্ঠতম এই মানুষগুলো যে পরশ পাথরের ছোঁয়ায় সোনা হয়ে উঠেছিলো, তা ইসলামী শিক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়, যে শিক্ষার প্রচারক ছিলেন রাসূল (সা:) নিজে। ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা যে কেবল নৈতিকতার দিক থেকেই উন্নত ছিলেন তা-ই নয়, পরবর্তী যুগে দেখতে পাই মুসলিমদের মধ্য থেকেই ইবনে সিনা, খাওরিজমি, জাবির ইবনে হাইয়্যান, ইবনে তাইমিয়া, ইবনে খালদুন, ওমর খৈয়াম, আল হাসানের মত চিকিৎসক, গণিতবিদ, রসায়নবিদ, পদার্থবিদ, ইসলামী দার্শনিক ও তার্কিক। যারা নৈতিকতার দিক থেকে যেমন আবু-বকর, ওমরের যোগ্য উত্তরসূরি, তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখাকে তাদের মেধা, চিন্তাশীলতা, গবেষণার মাধ্যমে নিয়ে গিয়েছিলেন উৎকর্ষতার সর্বোচ্চ শিখরে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় মানবতার বিকাশ সাধন, তাহলে সেই উদ্দেশ্য সাধনে দরকার এমন সার্থক শিক্ষাব্যবস্থা, আর এই ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও ফলাফল আমরা আর কোথায় পাবো ?

Bangladesh Islami Chhatrisangstha
http://www.islamichhatrisangstha.org

তবুও অদম্য আমাদের মেধাবীরা

২৬

কাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি, সঠিক পরিচর্যার অভাব সত্ত্বেও এদেশের শিক্ষার্থীরা তাদের মেধার স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাদের উদ্ভাবনী শক্তি, সৃজনশীলতা বিশ্বে আমাদের মর্যাদাকে বাড়িয়ে তুলেছে। প্রযুক্তির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার, বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় বিশ্বের নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া, মানবজাতির জন্য ক্ষতিকর সব রোগসমূহের কারণ ও এর প্রতিকার আবিষ্কার ইত্যাদি কাজসমূহে আমাদের তরুণরা সাফল্য অর্জন করছে। এসিএম আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগীতায় মোট ১১২টি দল অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে বুয়েট ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও ছিল। বুয়েট এখানে পর পর ১৭ বার অংশগ্রহণ করে। এ রকম ধারাবাহিক সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে পৃথিবীর মাত্র ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়। পেছনে রয়েছে তথ্য প্রযুক্তির মহাশক্তিধর ভারতের একটি দল, ইরানের সুবিখ্যাত শরিফ বিশ্ববিদ্যালয়, এমআইটি, যুক্তরাষ্ট্রের ক্যামব্রিজ, কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণরা সম্প্রতি হারানো গাড়ি, হারানো নৌযান বা বাসের অবস্থা জানার জন্য ট্র্যাকিং ডিভাইস তৈরী করেছেন। এছাড়া পাটের জীবন রহস্য উদ্ভাবন, বাতাস চালিত মোটর বাইক, চুম্বক শক্তির সাহায্যে রেললাইন বিহীন রেল চলাচল ইত্যাদি অসংখ্য উদ্ভাবন প্রতিনিয়তই আমাদের গবেষকরা করে যাচ্ছেন। এতো সীমিত উপকরণের মধ্যেও মেধার এ চমৎকার বিকাশ সত্যিই বিস্ময়কর।

Bangladesh Islami Chhatrisangstha
http://www.islamichhatrisangstha.org

কিন্তু আজও আমরা স্বপ্ন দেখি...

২৭

আমরা স্বপ্ন দেখি, আমাদের এই দেশ হবে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী, সমৃদ্ধ, মানব সম্পদে পরিপূর্ণ এক দেশ। যে দেশ থেকে এমন মানুষ বেরিয়ে আসবে, যারা শুধু জ্ঞান-গরিমায় শ্রেষ্ঠ হবে না, উন্নত চরিত্রের, সর্বোত্তম নৈতিকতার প্রকাশ থাকবে তাদের মাঝে।

প্রিয় ছাত্রী বোন, আপনিও নিশ্চয়ই এই স্বপ্ন দেখেন! কিন্তু এই স্বপ্ন পূরণের জন্য, সেই কাঙ্ক্ষিত মানের মানুষ গড়তে একটি যথার্থ, আদর্শ মানের শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন প্রথম ও প্রধান শর্ত।

ইতিহাসের দৃষ্টান্তগুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেয়, ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশের সেই দাবী সর্বোত্তমভাবে পূরণ হওয়া সম্ভব। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের এই দেশে, যে দেশে শহীদ আব্দুল মালেকের* মতো মেধাবী শিক্ষার্থী ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার দাবীতে প্রাণ দিয়েছেন, সেই দেশে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থাই কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাব্যবস্থা হবার দাবী রাখে।

হে সচেতন ছাত্রীবোন! আসুন, একটি শ্রেষ্ঠ সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র গঠনে কাঙ্ক্ষিত, যথার্থ, আদর্শ শিক্ষানীতি প্রণয়নের দাবীতে আমরা সোচ্চার হই। ইসলামী শিক্ষার আলোয় আলোকিত, আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে সচেতন ও তৎপর এক সমাজ গড়ে তুলতে অংগীকারাবদ্ধ হই। আমাদের সচেতন ভূমিকার মাধ্যমেই এদেশে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে আলোকিত সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হওয়া সম্ভব।

আল্লাহ আমাদের স্বপ্ন পূরণের অগ্রযাত্রাকে সফল করুন। আমীন।

*১৯৬৯ সালের ২ আগষ্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন করা হয় এক আলোচনা সভার। সেখানে 'শিক্ষা ব্যবস্থার আদর্শিক ভিত্তির' উপর যুক্তি ও তথ্য নির্ভর আলোচনা রাখেন তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন বিভাগের তুখোড় ছাত্র শহীদ আবদুল মালেক। ১৯৬৯ সালের ১২ আগষ্ট ডাকসুর উদ্যোগে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার বিপক্ষে আরেকটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ইসলাম সম্পর্কে চরম আপত্তিকর আলোচনা উঠলে শহীদ আবদুল মালেকের নেতৃত্বে কিছু ছাত্র প্রতিবাদ জানায়। ফলে অনির্ধারিতভাবে সভা শেষ হয়। সভা শেষে ফেরার পথে শহীদ আবদুল মালেকের উপর নির্মমভাবে হামলা চালানো হয়। পৈশাচিক এ হামলায় ১৯৬৯ সালের ১৫ই আগস্ট ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ শহীদ আবদুল মালেক শাহাদাৎ বরণ করেন। এ ঘটনাকে সামনে রেখে প্রতি বছর ১৫ই আগস্ট 'ইসলামী শিক্ষা দিবস' পালন করা হয়।

জ্ঞান সম্পর্কিত হযরত আলী (রাঃ)-এর ১০টি উক্তি

১. জ্ঞান উত্তম, কারণ এটা বিতরণে বেড়ে যায়, অথচ সম্পদ বিতরণে কমে যায়।

২. তোমাকে সম্পদ পাহারা দিতে হয়, কিন্তু জ্ঞান তোমাকে পাহারা দেয়। সুতরাং জ্ঞান উত্তম।

৩. একজন সম্পদশালীর যেখানে শত্রু থাকে অনেক, সেখানে একজন জ্ঞানীর বন্ধু থাকে অনেক। অতএব জ্ঞান উত্তম।

৪. জ্ঞান হলো মহানবী (সাঃ) এর নীতি আর সম্পদ ফেরাউনের উত্তরাধিকার। সুতরাং জ্ঞান সম্পদের চেয়ে উত্তম।

৫. জ্ঞান উত্তম, কারণ একজন জ্ঞানী লোক দানশীল হয়, অন্যদিকে সম্পদশালী ব্যক্তি হয় কৃপণ।

৬. জ্ঞান চুরি করা যায়না, কিন্তু সম্পদ চুরি হতে পারে। অতএব জ্ঞান উত্তম।

৭. জ্ঞান উত্তম। কারণ জ্ঞান মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করে যেমন আমাদের মহানবী (সাঃ) আল্লাহকে বলেছেন, "আমরা আপনার উপাসনা করি, আমরা আপনারই দাস।" অন্যদিকে সম্পদ ফেরাউন ও নমরুদকে বিপদগ্রস্থ করেছে। যারা দাবী করে যে তারাই ইলাহ।

৮. সময় জ্ঞানের কোন ক্ষতি করেনা, কিন্তু সম্পদ সময়ের পরিবর্তনে ক্ষয় হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং জ্ঞান উত্তম।

৯. জ্ঞান হৃদয়-মনকে জ্যোতির্ময় করে, কিন্তু সম্পদ একে মসি লিপ্ত করার মত। সুতরাং জ্ঞান উত্তম।

১০. জ্ঞান সীমাহীন, কিন্তু সম্পদ সীমাবদ্ধ এবং গণণা করা যায়। অতএব জ্ঞান উত্তম।

Bangladesh Islami Chhatrisangstha
http://www.islamichhatrisangstha.org

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থা

www.islamchhatrisangstha.org, Email - chatrisangstha.bd@gmail.com

Bangladesh Islami Chhatrisangstha
http://www.islamichhatrisangstha.org